অর্থনৈতিক উন্নয়ন

ইউনিট ৬

পাঠ ১ : প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি তা বলতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধাসমূহ দূরীকরণের উপায় বলতে পারবেন।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন :

মনে করুন, আপনি বাংলাদেশের অবস্থা এবং উন্নয়ন নিয়ে ভাবছেন। আপনি বিগত বৎসরগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে তাকালে দেখতে পাবেন মাথাপিছু আয়, মাথাপিছু উৎপাদন, বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উন্নয়নগুলোর মধ্যেই রয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আসুন এখন আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে আলাদাভাবে জানার চেষ্টা করি।

অনেক অর্থনীতিবিদ প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই দু'টি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধারণা দু'টি এক নয়। অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন শব্দটি অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই একটি অংশ। সাধারণভাবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনুন্নত দেশের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যবহৃত হয় উন্নত দেশের জন্য। কারণ, অনুসৃত দেশের যে কোন ধরনের উন্নয়নকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা চলে। কিন্তু উন্নত দেশের সকল খাতই উন্নত অবস্থায় বিরাজমান। তাই বিভিন্নখাতের উন্নয়ন সেখানে উন্নয়নস্বরূপ বিবেচিত না হয়ে প্রবৃদ্ধিরূপে বিবেচিত হয়।

এবার আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের দেয়া সংজ্ঞাগুলো দেখি –

১. এ মডিসন এর মতে, "উন্নত দেশগুলোতে মানুষের আয়সীমা বৃদ্ধি পেলে তাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে এবং অনুন্নত দেশে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয়।" A. Maddison – Economic Progress and Policy in Developing Countries.

২. কিন্ডলবার্গার এর মতে, "অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হল অধিক উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন অধিক উৎপাদন এবং যে সব কারিগরী কৌশল ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ উৎপাদন বিতরণ ও সম্পাদিত হয় তাদের পরিবর্তন উভয়কেই বুঝায়।" C. P. Kindleberger – Economic Development.

৩. ফ্রিজম জন ফ্রিডম্যান বলেন, "সামাজিক ব্যবস্থাকে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন না করে এক বা একাধিক মাত্রায় প্রসার ঘটানোকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে। আবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থার নতুন কোন কাঠামোগত পরিবর্তন আনা।" – John Friedmann – Growth Centres in Regional Economic Development. উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা দেশের জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ইত্যাদির বাৎসরিক বৃদ্ধি বোঝায়।

অন্যদিকে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে দেশের জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, উৎপাদন ক্ষমতা ও জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতির এক দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়াকে বুঝায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয় এবং সমাজে নতুনতর গতিবেগ সৃষ্টি হয়। উন্নয়ন শুধুমাত্র উৎপাদনের পরিমাণবাচক পরিবর্তনই আনয়ন করেনা, সাথে সাথে গুণবাচক পরিবর্তনও আনয়ন করে।

উন্নয়ন প্রবৃদ্ধি এবং হ্রাস দু'টোকেই ধারণ করে। একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলেও তাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন না হতে পারে কারণ দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অসম বন্টন ইত্যাদি কারিগরী ও কাঠামোগত পরিবর্তনের অনুপস্থিতির কারণে দেশ আগের অবস্থানেই থাকতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন কল্পনা করা অসম্ভব। অতএব, এ আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হল অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই একটি অংশ।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন কি তা জানলাম। এবার আসুন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানগুলো সম্পর্কে জানি।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানসমূহ :

অর্থনীতিবিদগণ প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া দুই ধরনের উপাদানের উপর নির্ভরশীল : অর্থনৈতিক উপাদান (Economic Factor) ও অ-অর্থনৈতিক উপাদান (Non-economic Factor)

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, জনশক্তি, মূলধন, উদ্যোক্তা, প্রযুক্তি ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। এগুলোকেই বলা হয় অর্থনৈতিক উপাদান। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্ভব নয় যদি না দেশের সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মানুষের নৈতিকতা ইত্যাদি দেশের উন্নয়নে সহায়তা না করে। এই উপাদানগুলোকেই অ-অর্থনৈতিক উপাদান বলা হয়। এবার অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা করা যাক —

অর্থনৈতিক উপাদান :

অর্থনীতিবিদগণ উৎপাদনের উপকরণকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তিরূপে নির্দেশ করেন। দেশের প্রবৃদ্ধির হারের উঠানামা এগুলোরই ফলাফল। নিম্নে কয়েকটি অর্থনৈতিক উপাদান আলোচনা করা হল –

প্রাকৃতিক সম্পদ :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল উপাদান হল প্রাকৃতিক সম্পদ, বা ভূমি। অর্থনীতিতে 'ভূমি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। জমির উর্বরতা, অবস্থান, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, জলবায়ু, পানি সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ সবগুলোই 'ভূমি' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। প্রবৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদের উপস্থিতি আবশ্যক। যে দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নয় সে দেশের দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে না। অনুন্নত দেশগুলোতে প্রাকৃতিক সম্পদ হয় অব্যবহৃত, না হয় অর্ধ ব্যবহৃত অথবা ভুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইহা তাদের পশ্চাৎপদের একটি কারণ। একটি

দেশের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকাই তার প্রবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয় যদি না তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। অনেক অনুন্নত দেশ তাদের প্রযুক্তিগত সমস্যা এবং আর্থিক বিনিয়োগের স্বল্পতার জন্য তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেনা। একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ততা থাকা সত্ত্বেও কোন দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। ইহা সম্ভব হয় তাদের সীমিত সম্পদের নতুন ব্যবহার আবিষ্কারের মাধ্যমে। এর উদারহণরূপ, আমরা জাপানের কথা বলতে পারি। জাপান প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ত সত্ত্বেও তারা তাদের সীমিত সম্পদের নতুন ধরনের ব্যবহার আবিষ্কার, বিদেশ হতে কাঁচামাল এবং কিছু খনিজ আমদানীর মাধ্যমে উন্নত জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম প্রধান শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে।

মূলধন গঠন (Capital Accountation) :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মূলধন গঠন। বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে যে সব দ্রব্য মানুষের শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিক উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলে। কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকৃত মূলধন দ্রব্যের মজুদ বৃদ্ধিকে মূলধন গঠন বলে। মূলধন গঠন প্রাথমিকভাবে সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে। মূলধন গঠন তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধাপে সম্পন্ন হয় –

১. আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি এবং তাদের বৃদ্ধি
২. সঞ্চিত অর্থকে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা সঠিক স্থানে যোগান দেয়া
৩. এই আর্থিক সঞ্চয়কে বিনিয়োগের জন্য মূলধন দ্রব্যে রূপান্তর।

মূধধন গঠনের হারকে বৃদ্ধি করার অনেক ধরনের উপায় রয়েছে। অনুন্নত দেশগুলোতে সঞ্চয় প্রবণতার হার কম বলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের আশ্রয় নেয়া দরকার। বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ভোগ কমায় এবং ফলশ্রুতিতে মূলধন গঠনে সম্পদ যুক্ত হয়। বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি হল করারোপ, ঋণ ইত্যাদি। অনুন্নত দেশে গ্রামাঞ্চল থেকে বেকার লোকের শহরে স্থানান্তরের মাধ্যমেও মূলধন গঠিত হয়। মূলধন গঠন প্রবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। অনুন্নত দেশে মূলধন গঠনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া জাতীয় উৎপাদন বিভিন্ন উপায়ে বৃদ্ধি করে। অনুন্নত অর্থনীতিতে মূলধন গঠন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মোকাবেলার জন্য আবশ্যিক। মূলধন দ্রব্যে বিনিয়োগ শুধু উৎপাদনই বৃদ্ধি করে না, চাকুরীর সুযোগও সৃষ্টি করে। প্রযুক্তিগত উন্নতি মূলধন গঠন দ্বারা চালিত হয় যা দেশকে বৃহদায়তন উৎপাদনে যেতে সহায়তা করে। মূলধন গঠনের মাধ্যমেই দেশের পরিবহন ও যোগাযোগ, শক্তি, শিক্ষা ইত্যাদির উন্নয়ন সম্ভব। মূলধন গঠনই প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু উত্তোলন ও ব্যবহার, দেশের শিল্পায়ন, বাজারের বিস্তৃতি ইত্যাদি নিশ্চিত করে যেগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য আবশ্যিক।

উদ্যোক্তা :

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল উদ্যোক্তা। সংগঠক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিভিন্ন উপাদানের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে। সংগঠক মূলধন এবং শ্রমের পরিপূরক এবং তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আধুনিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে, উদ্যোক্তা সংগঠকের ভূমিকা পালন করছে এবং সে অনিশ্চয়তার ঝুঁকি গ্রহণ করছে। একজন উদ্যোক্তা একজন অর্থনৈতিক নেতা হিসেবে কাজ করে। কারণ সে নতুন দ্রব্য, নতুন প্রযুক্তি, যোগানের নতুন উৎস ইত্যাদির সুযোগ গ্রহণ করছে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনা, শ্রমশক্তি ইত্যাদি এক জায়গায় জড় করছে এবং তাদের সংগঠিত করছে। অনুন্নত দেশে উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। অনুন্নত দেশে উদ্যোক্তার অভাব রয়েছে। অনুন্নত দেশের বাজারের

আকার ছোট, মূলধন ঘাটতি, প্রযুক্তিগত অভাব, কাঁচামালের অভাব, অবকাঠামোগত অসুবিধা ইত্যাদি ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় বলে সেখানে উদ্যোক্তার অভাব তীব্র।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি :

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রযুক্তিগত প্রবৃদ্ধি কিছু নতুন গবেষণা বা আবিষ্কারের কৌশলের ফলাফলের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রযুক্তির উন্নতি শ্রমিক, মূলধন এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

প্রযুক্তির উন্নয়নের পাঁচটি উপাদান রয়েছে –

১. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার (Scientific discovery)
২. আবিষ্কার (Invention)
৩. নতুন আবিষ্কার (Innovation)
৪. উন্নতি (Improvement)
৫. উন্নতির সহায়ক হিসেবে আবিষ্কারের বিস্তৃতি।

এর মধ্যে প্রবৃদ্ধির জন্য নতুন আবিষ্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উপাদান। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে এই পাঁচটি উপাদান সহায়তা করে। অনুন্নত দেশগুলোর তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিদেশ হতে আধুনিক প্রযুক্তি আমদানী করা উচিত কারণ তাদের নিজেদের আবিষ্কার করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে না। তবে তাদের প্রযুক্তি আমদানী করার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী দক্ষতাও বাড়াতে হবে।

শ্রমের বিভাজন ও উৎপাদনের মাত্রা :

বিশেষায়ন এবং শ্রমের বিভাজন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। ইহা অর্থনীতিকে বৃহদায়তন উৎপাদনে চালিত করে যা পরবর্তীতে শিল্পোন্নতিতে সহায়তা করে। ইহা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করে। শ্রমের বিভাজন শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে প্রত্যেক শ্রমিকেরই পূর্বের চেয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যা তার সময় বাঁচায়। এতে শ্রমিক নতুন মেশিন এবং উৎপাদনের উপায় আবিষ্কারে সক্ষম হয়। শ্রমের বিভাজন বাজারের আকারের উপর নির্ভর করে। আবার বাজারের আকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর নির্ভর করে।

যখন উৎপাদনের মাত্রা বেশি হয় হয় তখন বিশেষায়ন এবং শ্রমের বিভাজন বেশি হয়। ফলস্বরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গতিসম্পন্ন হয়।

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা :

অথনৈতিক প্রবৃদ্ধির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলে পরিবহন খরচ কমে যায় এবং দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুত সাধিত হয়।

কাঠামোগত পরিবর্তন :

কাঠামোগত পরিবর্তন হল দেশের সনাতন পদ্ধতির কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে আধুনিক শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে স্থানান্তরিত হওয়া। এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে দেশে চাকরির ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, মূলধনের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং সম্পদের নতুন ধরনের ব্যবহার ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধিত হয়। আর এগুলোই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

অনুশীলন :
অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন। পদক্ষেপগুলো তালিকাবদ্ধ করুন।

অ-অর্থনৈতিক উপাদান :

অ-অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উপাদানের পাশাপাশি প্রভাবিত করে। সামাজিক, রাজনৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি উপাদানসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উপাদানের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।
এবার আসুন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্তসমূহ নিয়ে আলোচনা করা যাক –

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্তসমূহ

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছু শর্তের উপর নির্ভরশীল। দেশ ও সময়ভেদে এ শর্তগুলির বিভিন্নতা থাকলেও উন্নয়নের পিছনে শর্তগুলি সব দেশেই প্রযোজ্য। নিম্নে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রধান শর্তসমূহ আলোচনা করা হল –

প্রাকৃতিক সম্পদ :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ভূমির উর্বরতা, নদ-নদী, অনুকূল আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত, বনজ ও খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য প্রভৃতি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। যে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যত বেশি সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা তত বেশি।

দক্ষ জনশক্তি :

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেবল প্রাকৃতিক সম্পদই যথেষ্ট নয়। প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য জনশক্তির দক্ষতা ও গুণগতমান বিশেষভাবে দরকার। দক্ষ জনশক্তির দ্বারা শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

মূলধন গঠন :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধনের ভূমিকা অপরিহার্য। মূলধন উৎপাদনের মাত্র বৃদ্ধি এবং উন্নত কলাকৌশলের সুযোগ সৃষ্টি করে। মূলধন গঠনের হার বেশি হলে বৃহদায়তন উৎপাদন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতির মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হয়। যে দেশে মূলধন গঠনের হার যত বেশি সে দেশ তত দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে।

শ্রম বিভাগ ও বিশেষীকরণ :

শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার আবার শ্রমবিভাগ, বিশেষীকরণ ও উৎপাদনের মাত্রার উপর নির্ভরশীল।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো :

অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই দরকার শক্তিশালী অবকাঠামো। উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, শক্তি সম্পদের উন্নয়ন, বাঁধ নির্মাণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার সম্প্রসারণ প্রভৃতির ফলে সমাজের শ্রমবিভাগ বৃদ্ধি পায়। শ্রমের গতিশীলতার পথে অন্তরায়গুলি দূর হয় এবং উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পায়।

মূলধনের উৎপাদনক্ষমতা :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মূলধনের উৎপাদনক্ষমতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মূলধনের উৎপাদনক্ষমতা বেশি হলে উৎপাদনের উপাদান ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পায়।

উন্নত প্রযুক্তি :
আধুনিক বিশ্বে নিত্য নতুন কলাকৌশল আবিস্কৃত হচ্ছে এবং প্রযুক্তির উন্নতি সাধিত হচ্ছে। সেই নতুন ও উন্নততর প্রযুক্তি ও কলাকৌশল উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান অনেক বৃদ্ধি পায়। আর উৎপাদনের উপরই উন্নয়ন নির্ভরশীল।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :
জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান গতি রোধ না করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যাত্রা শুরু করা দুঃসাধ্য। এজন্য জনসংখ্যা ও জনশক্তির আয়তন দেশের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।

উন্নত কারিগরী জ্ঞান :
উন্নত কারিগরী জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ নতুন নতুন আবিষ্কারে ব্রতী হবে। এতে মানুষের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত কারিগরী জ্ঞান আবশ্যিক।

উদ্যোক্তা :
অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ উদ্যোক্তাশ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা অভিজ্ঞতার আলোকে উৎপাদন কার্য পরিচালনার মাধ্যমে দ্রব্যের উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

শিক্ষা বিস্তার :
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। একটি দেশে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া উন্নয়ন চিন্তা করা যায় না। জনগণের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রসার না ঘটলে জনশক্তি দেশের কোন কাজে আসে না। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার ঘটানো আবশ্যক।

প্রতিযোগিতামূলক বাজার :
প্রতিযোগিতামূলক বাজার থাকলে উদ্যোক্তারা দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করে যা দ্রব্যের বাজার বিস্তৃতিতে সহায়তা করে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা :
কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। উন্নয়নের জন্য গৃহীত পরিকল্পনাসমূহ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকলে বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। আর অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত না হলে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হতে পারে না।

সামাজিক মূল্যবোধ :
অর্থনৈতিক উন্নয়ন সামাজিক মূল্যবোধের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের দ্বারা জাতিভেদ প্রথা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অদৃষ্টবাদিতা, পর্দাপ্রথা ইত্যাদি বিষয়গুলো দূরীভূত হয়ে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয় এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের পথ সুগম করে।

অনুশীলন :
অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরও পাঁচটি পূর্ব শর্ত উল্লেখ করুন।

এবার আমরা দেখি উপরের আলোচনার পূর্বশর্তগুলি বাংলাদেশে কতটুকু বিদ্যমান –

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নত দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্তগুলি বাংলাদেশে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান নয়। তবে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল, বনজ সম্পদ, মৎস্য ও শক্তিসম্পদ রয়েছে। তাছাড়া আমাদের জমি কৃষি কাজের জন্য খুবই উপযোগী। এরপরও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা খুব একটা সফল নয়।

এবার আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্ব শর্তগুলো বাংলাদেশে কতটুকু বিদ্যমান সে বিষয়ে আলোচনা করব –

১. বাংলাদেশের বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র এবং কৃষির উপযোগী আবহাওয়া থাকলেও জনসংখ্যার তুলনায় জমির সংখ্যা অপ্রতুল। এছাড়া তেল, কয়লা, লোহা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের অভাবে শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

২. বাংলাদেশের জনসংখ্যার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত। এছাড়া দেশের অধিকাংশ অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। শিক্ষার অভাবে জনসংখ্যার গুণগত মানও অত্যন্ত নীচু। দক্ষ জনসংখ্যা ও শিক্ষার অভাবে দেশ উন্নতির কাঙ্খিত সীমায় পৌঁছতে পারছে না।

৩. বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। দেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। ব্যাপক দারিদ্রের কারণে জনগণের সঞ্চয় কম এবং সর্বোপরি তারা প্রয়োজনীয় মূলধন গঠনে অক্ষম। আবার দেশের আমদানি ব্যয়ের তুলনায় রপ্তানি আয় অনেক কম। তাই এদেশে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

৪. বাংলাদেশ শিল্পে অনুন্নত। এই অনুন্নতির ফলে দেশে শ্রমবিভাগ এবং বিশেষীকরণের মাত্রা অনেক কম। উৎপাদন ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারে অদক্ষতা, বাজার ব্যবস্থার অপূর্ণতা, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার অভাব প্রভৃতি বিষয়গুলোও এদেশে উন্নয়নের গতিকে রোধ করে রেখেছে।

৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, শক্তি সম্পদের স্বল্পতা, শিক্ষার অভাব, অনুন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য এদেশের উন্নয়নের গতি শ্লথ।

৬. বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষা ও কারিগরী জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এজন্য দেশে নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার উদ্ভব ঘটে না। তাই উৎপাদনক্ষেত্রের বিকাশ বিঘ্নিত হচ্ছে। এবং কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে দেশ পৌঁছতে পারছে না।

৭. বাংলাদেশের আয় ও সম্পদের বন্টন সুষম নয়। ফলে বিনিয়োগ ব্যবস্থা যথাযথভাবে সংঘটিত হয় না।

৮. শিক্ষার অভাবে এদেশের সমাজে কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি বিদ্যমান। এছাড়া আরও কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা রয়েছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা স্বরূপ।

৯. বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী ও ঝুঁকি গ্রহণকারী উদ্যোক্তার সংখ্যা খুবই নগণ্য। ফলে শিল্পোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

১০. বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নেই বললেই চলে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাঘাত ঘটাছে এমনকি দেশ পিছনে চলে যাচ্ছে।

১১. তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূলে নয়।

উপরের আলোচনায় অনেক সমস্যা বা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বেশ কিছু উপাদানের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বলা যায় যে, এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এদেশে রয়েছে বিপুল জনশক্তি ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে সঠিক পরিকল্পনার সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

অনুশীলন :
বাংলাদেশ কোন্ কোন্ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ? সকল প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু উত্তোলন ও ব্যবহার হচ্ছে বলে আপনার মনে হয়?

আমাদের এবারের আলোচনার বিষয়বস্তু হবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথের সমস্যা বাধাসমূহ।

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাসমূহ :

বাংলাদেশ একটি অনুন্নত কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধাসমূহ উন্নয়নের পূর্ব শর্তগুলোর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। চলুন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রধান বাধাসমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করি –

দারিদ্রের দুষ্টচক্র :

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের বেশিরভাগ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। দারিদ্র্যের জন্য একটি অনুন্নত দেশ অনুন্নতই থেকে যায়। বাংলাদেশে দারিদ্রেতার জন্য জনগণের আয়স্তর নীচু। এজন্য দেশে সঞ্চয়ের হার কম। আবার সঞ্চয় কম বলে মূলধন গঠনের হারও কম। ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ এবং মাথাপিছু উৎপাদনও কম। আবার মাথাপিছু উৎপাদন কম বলে আয়স্তরও কম। এভাবেই দেখা যায় বাংলাদেশ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপ :

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুবই উঁচু। দেশের আয়তন ও প্রয়োজনের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক এই অত্যধিক জনসংখ্যা দেশের জমি এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে দেখা দেয় মাথাপিছু উৎপাদন ও আয়ের নিম্নহার, সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের নিম্নহার, বেকারত্ব এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা। এগুলো বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদে অপূর্ণ ব্যবহার :

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু অন্যান্য অনুন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অনেক বেশি। তবে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকৃতি ও পরিমাণের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল তা ব্যবহার করার দিকটি। বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নত কলাকৌশলের অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব, সঠিক বিনিয়োগের অভাব এবং সর্বোপরি কার্যকর পরিকল্পনার অভাবে পূর্ণ সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। ফলে দেশ শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হতে পারছে না এবং তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে।

উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব :
অবকাঠামো, বিনিয়োগ, জ্ঞান ইত্যাদিসহ আরও অনেক কারণে উন্নত দেশের সকল প্রযুক্তি একটি অনুন্নত দেশে প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্ভব নয়। এজন্য অনুন্নত দেশে এমন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যাতে অধিক শ্রম, অল্প মূলধন এবং অদক্ষ সংগঠক স্থান পায়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রযুক্তির মান এখনও অনেক নীচু যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথকে মন্থর করে রাখছে।

দক্ষ জনশক্তির অভাব :
যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দরকার একটি দক্ষ জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশ যদিও একটি জনবহুল দেশ কিন্তু এদেশে শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তির অভাব তীব্র। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান নিম্ন, দারিদ্র্য, অপুষ্টি, শিক্ষার অভাব ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যার গুণগতমান অত্যন্ত নিম্ন। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তির অভাবে সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে তুলছে।

মূলধন গঠনের নিম্নহার :
বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ দরিদ্র। তাছাড়া দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের কারণে দেশের আয়স্তর নিম্ন। এজন্য সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হারও নিম্ন। তাছাড়া দেশের আমদানির চেয়ে রপ্তানি কম। তাই দেশের মূলধন গঠনের হার খুবই নিম্ন যা উন্নয়নের পথকে ত্বরান্বিত হতে বাধা দেয়।

উদ্যোক্তার অভাব :
দেশকে উন্নয়নের স্রোতে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে প্রয়োজন দক্ষ ও সাহসী উদ্যোক্তার। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কোন দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে পুঁজি বিনিয়োগ করে মুনাফা আহরণ বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এ অবস্থায় দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে ঝুঁকি বহন করার মত সাহসী উদ্যোক্তার সংখ্যা দেশে খুব কম।

কারিগরী জ্ঞানের অভাব :
উন্নয়নের ধাপে ধাপে কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। পর্যাপ্ত কারিগরী জ্ঞান ছাড়া উন্নত প্রযুক্তির আবিষ্কার এবং তার যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ পর্যাপ্ত কারিগরী জ্ঞানের অভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ড পিছিয়ে আছে।

অবকাঠামোর অভাব :
যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অবকাঠামোগত উন্নয়ন। বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত, শক্তি সম্পদের ঘাটতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব তীব্র। এজন্য এদেশে উৎপাদনের উপকরণের গতিশীলতা, উৎপাদনশীলতা কম এবং বাজার সীমিত। তাই দেশ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে।

শিক্ষার অভাব :
শিক্ষার অভাব অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এক বিরাট বাধাস্বরূপ। একটি দেশের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে তা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার অভাব থাকলে, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার না ঘটলে দেশের উন্নয়নের গতি মন্থর হয়ে যায়। বাংলাদেশের জনগণের পথও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা :
বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হল অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা। কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা পশ্চাৎপদ ও গতিহীন। বাংলাদেশের কৃষি আজও প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় যার ফলে কৃষি ফলন কম হচ্ছে। এজন্য দেশের বৃহত্তম খাত কৃষি থেকে কোন উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করা যাচ্ছে না যা মূলধন গঠনের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। ফলে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে না।

বৈদেশিক মুদ্রার অভাব :
দেশকে অগ্রসর করতে হলে প্রয়োজন অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দ্রুত শিল্পায়ন। এজন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু রপ্তানি বাণিজ্য শক্তিশালী না হওয়ায় দেশে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব রয়েছে। তাই বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে দেশের উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

খাদ্য ঘাটতি :
বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। এজন্য প্রতি বৎসর দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি পূরণের জন্য প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ খাদ্য আমদানি করতে হয় বলে দেশের উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ কম থাকে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

প্রতিকূল ধর্মীয় ও সামাজিক পরিবেশ :
বাংলাদেশে শিক্ষার নিম্নহারের জন্য সমাজে অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি বিরাজমান। তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন দেশের উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করছে।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :
একটি দেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে দরকার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও স্থিতিশীলতা। কিন্তু বাংলাদেশসহ অন্যান্য অনুন্নত দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র বিরাজ না করায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়। এজন্য দীর্ঘমেয়াদী কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। ফলে দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থবিরতা দেখা দেয়।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান পাঁচটি বাধা চিহ্নিত করুন।

এবার আসুন দেখা যাক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথের বাধাসমূহ দূর করার উপায়গুলো –

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধাগুলি দূর করার উপায় :

মূলধন গঠন :

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙ্গার অন্যতম প্রধান উপায় হল দেশের অভ্যন্তরে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি করা। আবার দেশকে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর হতে হলে দরকার পর্যাপ্ত মূলধন। তাই ভোগের পরিমাণ কমিয়ে সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা যায়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ :

বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি যা দেশের জন্য নানান সমস্যা বয়ে আনছে। দেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাওয়ার জন্য উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হচ্ছে। উন্নয়নের হারের চেয়ে যাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে তা সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে পারলে জনগণের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুত গতি লাভ করবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার :

যথাযথ উৎপাদন কৌশল ও পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের পর্যাপ্ত উত্তোলন ও ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য দেশে নতুন খনিজ সম্পদের আবিষ্কার ও তা সংরক্ষণ করতে হবে।

প্রযুক্তির উন্নয়ন :

উন্নত দেশের মূলধন-নির্ভর প্রযুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ অনুন্নত দেশে সম্ভব নয়। আবার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈদেশিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য অনুন্নত দেশের শ্রম আধিক্য ও মূলধন স্বল্পতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার বিস্তার :

দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। আবার বাংলাদেশে উন্নয়নমুখী সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে ব্যাপক হারে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরী শিক্ষারও প্রসার ঘটাতে হবে। এতে শ্রমিকেরা নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ ও উদ্ভাবনে সক্ষম এবং দক্ষ হয়ে উঠবে যা উন্নয়ন কাজকে গতিসম্পন্ন করবে।

খাদ্যে স্বয়ংস্পূর্ণতা অর্জন :

বাংলাদেশে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা করতে হয়। এজন্য বিদেশ হতে খাদ্য আমদানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। ফলে অন্যান্য খাতে বিনিয়োগের জন্য মূলধন কমে যায়। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে বৈদেশিক মুদ্রা শিল্প মূলধন হিসেবে কাজে লাগাতে পারলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি :

বাংলাদেশ কারিগরী বিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশল সম্পর্কে অবহিত করে তুলতে হবে। এতে দেশে দক্ষ জনশক্তির সৃষ্টি হবে এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি :
দক্ষ ও সাহসী উদ্যোক্তা শ্রেণী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য দেশে দক্ষ উদ্যোক্তা এবং বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ :
দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য দেশের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং দেশের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে হবে। বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হবে।

উন্নত অবকাঠামো সৃষ্টি :
দেশের অভ্যন্তরীণ পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শক্তি সম্পদের ঘাটতি পূরণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ করতে হবে। এতে দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রব্যের বাজারের সম্প্রসারণ ঘটবে।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন :
দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বিদেশী সাহায্যে ও কারিগরী নির্ভর পরিকল্পনা পরিহার করে দেশীয় প্রযুক্তি ও সম্পদ নির্ভর সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর বলে কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

দক্ষ প্রশাসন :
অদক্ষ প্রশাসন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অবহেলা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি কারণে অনেক সময় দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয় এমনকি অনেক সময় উদ্যোক্তা বিনিয়োগের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। অথচ বিনিয়োগ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে।

রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং স্থিতিশীলতা :
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দেশের সকল রাজনৈতিক দলের গঠনমূলক ও অনুকূল মতাদর্শ এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। তাই দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকা জরুরী।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য আরও পাঁচটি পদক্ষেপের কথা লিখুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।
২. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপাদানসমূহ আলোচনা করুন।
৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্তসমূহ বাংলাদেশ কতটুকু বিদ্যমান আছে বলে মনে হয়?
৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন।
৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাসমূহ দূর করার জন্য কোন্ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন?

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন

১. আধুনিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রযুক্তির উপাদান নয় কোনটি?
   ক. বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার — খ. নতুন আবিষ্কার
   গ. উন্নতি — ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান শর্ত নয় কোনটি?
   ক. মূলধন গঠন — খ. মুনাফা অর্জন
   গ. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ — ঘ. প্রতিযোগিতামূলক বাজার
৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা নয় কোনটি?
   ক. মূলধন গঠনের নিম্নহার — খ. নির্দিষ্ট জমির সুষ্ঠু ব্যবহার
   গ. দক্ষ জনশক্তির অভাব — ঘ. অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা
৪. কি কারণে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হয়?
   ক. অদক্ষ প্রশাসন — খ. দীর্ঘ সময় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
   গ. সুষ্ঠু বিনিয়োগ — ঘ. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা
৫. কোনটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে না?
   ক. অশিক্ষা — খ. কুসংস্কার
   গ. ধর্মান্ধতা — ঘ. কম সঞ্চয়

পাঠ — ২ : বাংলাদেশের অর্থনীতি : উন্নত, অনুন্নত নাকি উন্নয়নশীল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ কি বলতে পারবেন।
- উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন।
- বাংলাদেশ কোন ধরনের দেশ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আসুন আমরা বিশ্বের অবস্থা নিয়ে একটি চিন্তা করি। প্রথমেই আসা যাক উত্তর আমেরিকার দেশগুলোর অবস্থা পর্যালোচনায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা আমরা সবাই কম বেশী জানি। আমরা জানি সেখানকার জনগণ আর্থিকভাবে খুবই স্বচ্ছল। তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত, তাদের শিক্ষার হার প্রায় ১০০ ভাগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুবিধা সঠিকভাবে পাচ্ছে, বিশ্ব বাণিজ্যে তারা আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এক কথায়, আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা সুসংহত এবং দেশ জনগণের সুবিধার দিকে পূর্ণ সজাগ। এবার আসুন আফ্রিকার দিকে তাকাই। দেখা যাক ইথিওপিয়ার অবস্থা। সেখানকার জনগণ দরিদ্র, অপুষ্টির শিকার, আয় কম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ইত্যাদি। উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে দু'টো দেশের তুলনামূলক অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করতে পারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা ইথিওপিয়ার চেয়ে অনেক ভাল। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল উন্নত রাষ্ট্র এবং ইথিওপিয়া হল অনুন্নত রাষ্ট্র। তাহলে চলুন এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা যাক্।

অর্থনৈতিক উন্নতির মাত্রা এবং স্তরের ভিত্তিতে বিশ্বের দেশসমূহকে প্রধানতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে –

ক. উন্নত দেশ
খ. অনুন্নত দেশ এবং
গ. উন্নয়নশীল দেশ।

এবার চলুন দেশগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহকে আরও পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করা যাক্।

উন্নত দেশ :

উন্নত দেশ বলতে সাধারণতঃ সে সকল দেশকেই বুঝায় যে সকল দেশ আধুনিক উৎপাদনের কলা-কৌশল ও উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসহ মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে মাথাপিছু আয়ের সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ঘটিয়ে উচ্চ মানের জীবনযাত্রা জনগণের জন্য আনয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। এসব দেশসমূহে জাতীয় আয় অনেক বেশি তাই মাথাপিছু আয়ও বেশি। ফলে জনগণের সঞ্চয়ের হার বেশি। এজন্য মূলধন গঠনের হারও বেশি। এজন্য বিনিয়োগের হারও বেশি। এ সকল দেশের জাতীয় আয়ের সুষম বন্টন হয় বলে জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক উঁচু। উন্নত দেশসমূহে আধুনিক ও উন্নততর বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল ব্যবহৃত হয় বলে উৎপাদনের খরচ কম হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশি। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি খাতগুলি উন্নত এবং জনগণের চাহিদা পূরণে সক্ষম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমাজের সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং দেশে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে বলে বেকারত্বের হার নগণ্য। কৃষিজ উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হলেও এসব দেশসমূহ মূলতঃ শিল্প প্রধান। বাণিজ্যিক ভারসাম্য এসব দেশের অনুকূলে থাকে। শিক্ষা, সংস্কৃতিসহ সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এসব দেশ অনেক অগ্রগামী।

বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, কানাডা, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশসমূহ উল্লেখযোগ্য।

অনুন্নত দেশ :

যে সব দেশে প্রকৃতপক্ষে কোন অর্থনৈতিক উৎপাদন হয়নি, স্বল্প উৎপাদনের জন্য জনগণের মাথাপিছু আয় কম এবং জীবনযাত্রার মান নীচু, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ, জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ হয় না সে সকল দেশকে অনুন্নত দেশ বলা হয়। এ সকল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয় না এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় না। এখানকার অধিকাংশ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে ফলে অনুন্নত দেশের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় কম। তাই এখানে সঞ্চয়ের হার কম এবং মূলধন গঠনের হারও অনেক কম। এজন্য এসব দেশে বিনিয়োগও অনেক কম। তাই বলা যায়, অনুন্নত দেশ 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের' আবর্তে আবর্তিত। অনুন্নত দেশসমূহের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। এ সকল দেশে উৎপাদন ক্ষেত্রের স্বল্পতার জন্য বেকারত্বের হার অনেক বেশি। অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি। শিল্পে অনুন্নয়ন, স্বল্প উৎপাদনশীলতা, পুঁজি ও মূলধনের স্বল্পতা, অনুন্নত অবকাঠামো, নিরক্ষরতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুন্নত দেশে বিরাজমান।

উন্নয়নশীল দেশ :

যে সকল দেশ বিভিন্ন উন্নয়ন কৌশল এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হচ্ছে এবং কিছুটা উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। এ সকল দেশ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাধান করে। উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের জন্য আর্থ-সামাজিক ভিত্তি রচিত হয় এবং দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে অর্থনীতি ক্রমশঃ উন্নয়নের পথে ধাবিত হয়। এ সকল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উৎপাদনমূলক কাজের গতি বৃদ্ধিতে উৎসাহবোধ করে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাসহ দক্ষিণ এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার অনেক দেশ উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে অনুন্নত দেশ শব্দটি আর ব্যবহৃত হয় না। কারণ অনুন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের বৈশিষ্ট্য প্রায় একই। তাছাড়া সকল দেশই উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আলাদাভাবে চিনতে শিখলাম। এখন আসুন এ সকল দেশগুলোর বৈশিষ্ট্যসমূহ আরও বিস্তারিতভাবে জানা যাক্ –

উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য :

বিশ্বের সকল উন্নত দেশের উন্নয়নের স্তর সমান নয়। কোন দেশ একটু বেশি উন্নত আবার কোন দেশ একটু কম উন্নত। এদের উন্নয়নের স্তর সমান না হলেও সকল দেশের মধ্যে কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করা হল –

উচ্চ মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান :

উন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদৃঢ়। তাদের উৎপাদনের হার অনেক বেশি বলে জাতীয় আয়ও বেশি। তাই তাদের মাথাপিছু আয়ও অনেক বেশি। বিশ্বের প্রধান কয়েকটি উন্নত দেশের মাথাপিছু আয় ৮ হাজার থেকে ২০ হাজার মার্কিন ডলার। আয়ের আধিক্যের কারণে এসব দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অনেক উঁচু।

মূলধনের প্রাচুর্যতা :
উন্নত দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি হওয়ায় তাদের সঞ্চয়ের হার অনেক বেশি। এজন্য মূলধন গঠনের হারও অনেক বেশি। অধিক মূলধন গঠন বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং অধিক বিনিয়োগ অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করে।

শিল্পের উন্নয়ন :
উন্নত দেশসমূহ প্রধানতঃ শিল্প নির্ভর। এ সকল দেশের উন্নতি ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন থেকে উদ্ভুত। শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নয়ন এ সকল দেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। উন্নত দেশের অর্থনীতি শিল্প প্রধান হওয়ায় জাতীয় আয় ও রপ্তানি আয়ের সিংহভাগই শিল্প খাত থেকে আসে।

উন্নত ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা :
উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি শিল্প প্রধান হলেও কৃষি খাতে তারা পিছিয়ে নেই। তাদের অর্থনীতিতে যদিও কৃষিখাতের প্রাধান্য নেই তবুও কৃষি ব্যবস্থা অনেক উন্নত। কৃষি খাতে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিজ ফলন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা তাদের অর্থনীতিকে আরও সুদৃঢ় করছে।

সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার :
উন্নত দেশসমূহ প্রধানতঃ আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা তাদের দিন দিন বেড়েই চলছে। প্রযুক্তির উন্নত মানের জন্য তারা তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে। এছাড়াও বিভিন্ন মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে তারা তাদের বেকারত্বের হার কমিয়ে ফেলে এবং উন্নয়নকে আরও গতিশীল করে।

জনসংখ্যার কাম্য আয়তন :
বিশ্বের সকল উন্নত দেশের জনসংখ্যার আয়তন সমান নয়। সকল দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও সমান নয়। কিন্তু এ সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার অপেক্ষা জনসংখ্যার আয়তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কম থাকে। ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় ও ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। এ সকল দেশে শিক্ষার উচ্চহার, জনগণের সচেতনতা ও উন্নত জীবনযাত্রার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম।

দক্ষ জনশক্তি :
উন্নত দেশসমূহের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল দক্ষ জনশক্তি। এ সকল দেশে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি জ্ঞানের সুবিধা পর্যাপ্ত থাকায় জনগণের দক্ষতা অনেক বেশি। এজন্য শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি। তাই স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদনের হারও অনেক বেশি।

উন্নত অবকাঠামো :
যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোর গুরুত্ব অপরিসীম। উন্নত দেশসমূহে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি ব্যবস্থা অনেক উন্নত। এ সকল অবকাঠামোগত সুবিধার জন্য উন্নত দেশসমূহে শ্রমের গতিশীলতা বেশি, উৎপাদন ব্যয় কম, বাজারের আয়তন বৃহৎ। ফলে উৎপাদনের হারও বেশি।

অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য :
একটি দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকার অন্যতম পূর্বশর্ত হল বৈদেশিক বাণিজ্য তাদের অনুকূলে থাকা। উন্নত দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্য সবসময়ই তাদের অনুকূলে থাকে। এ সকল দেশের আমদানী ব্যয় থেকে রপ্তানি আয় সবসময়ই বেশি এবং রপ্তানি বাণিজ্য

বিকেন্দ্রীকৃত ও মূলতঃ শিল্প নির্ভর। তাই তারা বৈদেশিক বাণিজ্যে সবসময়ই উদ্বৃত্ত ভোগ করে যা তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নিশ্চিত করে।

শিক্ষার হার :
শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না বলে উন্নত দেশসমূহ সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে শিক্ষার উপর। তাদের শিক্ষা খাতে বেশি বিনিয়োগের ফলে শিক্ষা সুবিধা ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করেছে এবং শিক্ষার হার প্রায় ১০০ ভাগ। শিল্প নির্ভর বলে উন্নত দেশসমূহ কারিগরী শিক্ষার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করে। উন্নত দেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে সমাজ থেকে অনেক কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে।

কম বেকারত্ব :
উন্নত দেশসমূহে শিক্ষার হার অনেক উচ্চ এবং তাদের রয়েছে দক্ষ জনগোষ্ঠী। এছাড়া এখানে উৎপাদন ক্ষেত্র ব্যাপক হওয়ায় বেকারত্বের হার সর্বনিম্ন।

দক্ষ উদ্যোক্তার অনুপস্থিতি :
শিল্পায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল দক্ষ ও সাহসী উদ্যোক্তার উপস্থিতি। অনুন্নত দেশগুলো বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান নাই। আবার পুঁজির আধিক্যের কারণে অনুন্নত দেশসমূহে উদ্যোক্তার সংখ্যা অনেক কম।

অনুকূল আর্থ-সামাজিক পরিবেশ :
উন্নত দেশসমূহে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার কুসংস্কার, গোঁড়ামি, রক্ষণশীলতা ইত্যাদি বিরাজ করে। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকে বিজ্ঞান ও উৎপাদনবিমুখী।

সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব :
অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকলে উন্নয়ন সম্ভব হয় না। উন্নত দেশসমূহে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন হয়। কিন্তু অনুন্নত দেশসমূহে তা সম্ভব হয় না।

অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ :
উন্নত দেশসমূহের শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে জনগণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক। ফলে এসব দেশে সব সময় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান। তাই এখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহজতর হয়।

অনুশীলনী :
বিশ্বের পাঁচটি উন্নত দেশের কথা চিন্তা করুন। তাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ও কারণ উল্লেখ করুন।

অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য :
বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক্ –

স্বল্প মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার নিম্নমান :
অনুন্নত দেশসমূহের অধিকাংশ লোক দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। এসব দেশ মূলতঃ কৃষি নির্ভর হলেও কৃষিজ উৎপাদনের হার খুবই কম। শিল্পে পশ্চাৎপদের জন্য শিল্প উৎপাদন উল্লেখ করার মত নয়। তাই এসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় খুব কম। নিম্ন আয়ের জন্য তারা

তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে না বলে এখানে জীবনযাত্রার মানও খুব নিম্ন।

প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার :

অনুন্নত দেশগুলো প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি তাদের বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। এ জন্য অনেক দেশের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তার ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি তাদের নিকট নেই। আবার, অর্থাভাবে তা বিদেশ থেকে আনতেও পারে না। ফলে এসব দেশ দরিদ্রই থেকে যায়।

পুঁজির স্বল্পতা :

দারিদ্র্যের ও কম উৎপাদনশীলতার কারণে অনুন্নত দেশের মাথাপিছু আয় কম। তাই তাদের সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের হারও অনেক কম। এজন্য দেশে বিনিয়োগের হার খুব কম।

জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি :

অনুন্নত দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারের চেয়ে বেশি হারে। অধিক জনসংখ্যার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় তা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যাপক বেকারত্ব :

জনসংখ্যার আধিক্য, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব ইত্যাদি কারণে অনুন্নত দেশসমূহে বেকারত্বের হার খুবই বেশি। অনুন্নত দেশগুলোতে দুই ধরনের বেকারত্ব বিরাজমান। এক ধরনের বেকারত্বে সৃষ্টি হয় শিক্ষা এবং নগরায়নের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ার কারণে। এদেরকে শিক্ষিত বেকার বলা হয়। কারণ দেশে তাদের শিক্ষার উপযোগী কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে তারা বেকার থেকে যায়। আর এক ধরনের বেকারত্ব আছে যা হল বাধ্যতামূলক বেকারত্ব। এ ধরনের বেকারত্বে জনগণ যে কোন ধরনের কাজ চায় কিন্তু তাদের জন্য কোন কাজ থাকে না। অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে এ ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়।

দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব :

অনুন্নত দেশগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হল দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব। এ সকল দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় বিনিয়োগের জন্য উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসেনা। ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেনা। বাজারের ক্ষুদ্র আয়তন, পুঁজির স্বল্পতা, ব্যক্তিগত সম্পদের অভাব, চুক্তির স্বাধীনতার অভাব, প্রতিকূল বিনিয়োগ পরিবেশ ইত্যাদির কারণে অনুন্নত দেশে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হয় না। তাই অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নে গতি আসে না।

শিল্পের অনুন্নতি :

অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষি নির্ভর। তাই এসব দেশে শিল্পের গুরুত্ব অনেক কম। আবার, এসব শিল্পই পুঁজি এবং প্রযুক্তির অভাবে অগ্রসর হতে পারেনা। এসব দেশের জাতীয় আয়ের মাত্র ৮ থেকে ১০ ভাগ শিল্প থেকে আসে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপর্যাপ্ত।

কৃষি নির্ভর অর্থনীতি :

অনুন্নত দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভর। এ সকল দেশের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক গ্রামাঞ্চলে থাকে এবং তাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। কৃষির উপর অধিক নির্ভরশীলতা দারিদ্র্যের লক্ষণ। অনুন্নত দেশগুলি কৃষি নির্ভর হওয়া সত্ত্বেও তাদের কৃষি ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সম্পূর্ণ আদিম ও বর্তমানে বাতিলকৃত পদ্ধতি দ্বারা। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এসব দেশে নেই। তাই কৃষিজ উৎপাদনের হারও অনেক নিম্ন। আবার কৃষি ব্যবস্থা প্রকৃতি নির্ভর হওয়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজ উৎপাদনও ব্যাহত হয়। ফলে দেশের অর্থনীতি ক্রমশঃ নিম্নমুখী হতে থাকে।

কারিগরী জ্ঞানের অভাব :

অনুন্নত দেশের জনগোষ্ঠী মধ্যে দেশের শিক্ষা কাঠামো আধুনিক ও যুযোগযোগী নয়। ফলে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরী জ্ঞানের অভাবে দেশে কারিগরী জ্ঞান, আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব থাকে। এতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কমে যায় এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হয় না।

অনুন্নত কাঠামো :

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আবশ্যিক উপাদান হচ্ছে উন্নত অবকাঠামো। অনুন্নত দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রকার অবকাঠামোই অনুন্নত। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা খুবই কম। এতে দেশে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না এবং নতুন কোন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেনা। দ্রব্যের বাজারের বিস্তৃতি, শ্রমের গতিশীলতা, উৎপাদনের উচ্চ হার ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন আবশ্যিক।

শিক্ষার অভাব :

অনুন্নত দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কম হওয়ায় শিক্ষার সুযোগে-সুবিধা খুবই কম থাকে। এতে দেশে নিরক্ষরতার হার বেশি থাকে তা দক্ষ জনশক্তি গঠনে বাধা সৃষ্টি করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূলতা :

অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর বলে তারা সাধারণতঃ কৃষিদ্রব্য রপ্তানি করে থাকে। আবার শিল্পায়নের জন্য তারা শিল্পদ্রব্য আমদানী করে থাকে, তাই তাদের রপ্তানি আয় থেকে আমদানি ব্যয় বেশি। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়।

বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর :

অনুন্নত দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের স্বল্পতা থাকে। তাই তারা বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে। এজন্য তাদের বাজেট হয় বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর।

প্রতিকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ :

অনুন্নত দেশে জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। এতে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা :

অনুন্নত দেশের অধিকাংশ লোক থাকে অশিক্ষিত ও রাজনৈতিক অসচেতন। এজন্য এসব দেশে সুষ্ঠু সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শের অভাব দেখা দেয়। ফলে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। আর দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ না করলে

বিনিয়োগ, উৎপাদন কার্যক্রম ইত্যাদি ব্যাহত হয় এবং কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না।

সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব :

একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে পরিকল্পনা গ্রহণের উপর। অনুন্নত দেশসমূহে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গৃহীত হয় না বলে তারা উন্নয়ন কার্যক্রমে গতি আনতে পারেনা।

অনুশীলন :
বিশ্বের পাঁচটি অনুন্নত দেশের কথা ভাবুন। আপনার দৃষ্টিতে কেন তারা অনুন্নত।

উন্নয়নশীল দেশ :

বর্তমান বিশ্বে যদিও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ দু'টো সমার্থক এরপরও উন্নয়নশীল দেশের আলাদা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এবার চলুন বৈশিষ্ট্যগুলো জানা যাক –

১. উন্নয়নশীল দেশসমূহের মাথাপিছু আয় কম ও জীবনযাত্রার মান নিম্ন হলেও তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
২. এ সকল দেশে কৃষি ও শিল্পে ক্রম উন্নয়নের ধারা লক্ষ করা যায়।
৩. প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হচ্ছে।
৪. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেকারত্বের হার ক্রমশঃ কমে আসছে।
৫. উন্নয়নশীল দেশসমূহের পুঁজি একটি গোষ্ঠীর হাতে চলে যাচ্ছে ফলে সমাজে বেশ কয়েকটি শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে – পুঁজিপতি, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। এ সকল দেশে চরম গরীব ও উচ্চবিত্ত পাশাপাশি বিদ্যমান।
৬. অনুন্নত দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার হার বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।
৭. বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আনয়নের চেষ্টা চলছে।
৮. অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।
৯. কারিগরী শিক্ষার উপর জোর দেয়া হচ্ছে।
১০. দেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর থেকে শিল্প নির্ভরতার দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে।
১১. পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে।
১২. বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।

অনুশীলন :
আপনি কি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন?

উপরের আলোচনার মাধ্যমে আমরা উন্নত, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ চিনতে পারলাম। এবার আসুন বাংলাদেশ উপরোক্ত কোন বৈশিষ্ট্যে পড়ে তা বের করি –

বাংলাদেশ উন্নত, অনুন্নত নাকি উন্নয়নশীল দেশ?

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র কিন্তু জনবহুল দেশ। এ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। এদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের বেশিরভাগ আসে কৃষি থেকে। দেশের মোট শ্রমশক্তির সিংহভাগ কৃষির উপর নির্ভরশীল।

২. বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত এবং নিম্ন উৎপাদনশীল। এ দেশের কৃষিকাজ পরিচালিত হয় আদিম পদ্ধতিতে। কৃষি জমির ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা, অবৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতি, স্বল্প বিনিয়োগ, কৃষি-উপকরণের অভাব, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

৩. বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্পখাতের অবদান মাত্র ১০ থেকে ১২ ভাগ। আবার শ্রমশক্তির একটি ক্ষুদ্র অংশে শিল্পে নিয়োজিত। সুষ্ঠু শিল্পনীতির অভাব, শিল্প-মূলধনের স্বল্পতা, শ্রমিকের অদক্ষতা, বিনিয়োগের প্রতিকূল পরিবেশ, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ইত্যাদি কারণে এ দেশের শিল্প খাত সম্প্রসারিত হয়নি।

৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জমি ও অন্যান্য সম্পদের বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি।

৫. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। এদেশে কৃষি ও শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ কম বলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। তাই দেশে বেকারত্বের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. বাংলাদেশে স্বল্প উপাদান, জনসংখ্যাধিক্য ও বেকারত্বের জন্য মাথাপিছু আয় কম। এজন্য জনগণের জীবনযাত্রার মানও নিম্ন। এদেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে।

৭. বাংলাদেশ পুঁজি ও বিনিয়োগের অভাবে কারিগরী দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ ও উদ্বৃত্ত জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

৮. বাংলাদেশে উৎপাদন ও আয়ের স্বল্পতার জন্য সঞ্চয় ও পুঁজি গঠনের হার খুব কম। এজন্য দেশে বিনিয়োগের পরিমাণও কম।

৯. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো অনুন্নত ও অপর্যাপ্ত।

১০. বাংলাদেশের আমদানী ব্যয় রপ্তানি আয় অপেক্ষা অনেক বেশি।

১১. বাংলাদেশে শিক্ষার হার খুব কম।

১২. বাংলাদেশে কারিগরী জ্ঞানের অপর্যাপ্ততার কারণে দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে।

১৩. শিক্ষার অভাবে এদেশে প্রচুর ধর্মীয় ও সামাজিক গোঁড়ামি রয়েছে।

১৪. বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থিতিশীল। উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, অনুন্নত দেশের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান। তাই এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে একটি অনুন্নত দেশ বলা যায়।

কিন্তু বাংলাদেশে স্বাধীনতা পূর্ব ষাটের দশক থেকে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফলে অর্থনীতির মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন না হলেও দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। উন্নয়নে ভিত্তি ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছে। সমস্যা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতিশীলতা সৃষ্টি হয়েছে। দেশে শিল্পায়নের দিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এজন্য শিল্পের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং দেশীয় উদোক্তাদের শিল্প স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও তা বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। এতে জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। দেশে কারিগরী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। দেশের অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নিরক্ষরতার হার দূর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অতএব, উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

অনুশীলনী :
বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার বলে আপনি মনে করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।
২. উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।
৩. আপনি কেন একটি দেশকে অনুন্নত দেশ বলবেন?
৪. বাংলাদেশ উন্নত, অনুন্নত না উন্নয়নশীল দেশ যুক্তিসহ বলুন?

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন

১. উন্নত দেশের অর্থনীতি প্রধানত –
   ক. কৃষি নির্ভর খ. শিল্প নির্ভর
   গ. বাণিজ্য নির্ভর ঘ. প্রযুক্তি নির্ভর
২. নিম্নের কোনটি উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য নয়?
   ক. মাথাপিছু আয় বেশি খ. মূলধন গঠনের হার বেশি
   গ. শিক্ষার হার বেশি ঘ. বেকারত্বের হার বেশি
৩. নিম্নের কোনটি অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য?
   ক. কৃষি নির্ভর অর্থনীতি খ. দক্ষ উদ্যোক্তার অভাব
   গ. অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য ঘ. শিল্প নির্ভর অর্থনীতি
৪. নিম্নের কোনটি উন্নয়নশীল দেশ?
   ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ. জাপান
   গ. জার্মানী ঘ. ব্রাজিল
৫. নিম্নের কোনটি বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য?
   ক. সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার খ. প্রযুক্তির উৎকর্ষতা
   গ. বিনিয়োগ স্বল্পতা ঘ. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

সমস্যা
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই '৯৭ হাতে নিন। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু আয়, শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার, শিক্ষার হার, বেকারত্বের হার বের করুন। এ থেকে কি আপনার মনে হয় যে, বাংলাদেশ অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ ৩ : সামাজিক অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- অবকাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শক্তি সম্পদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পরিবহন ও যোগাযোগ খাত সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভূমিকা

আপনি দেশে বসবাসের জন্য এবং আপনার জীবন নির্বাহের জন্য দেশের সড়ক পথ, জলপথ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ডাক, টেলিফোন ইত্যাদি ব্যবহার করছেন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সেবা রাষ্ট্রের নিকট থেকে গ্রহণ করছেন।

আপনি জানেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই উপাদানগুলোর অবস্থান থাকা আবশ্যক। একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে চালু রাখার জন্য কতিপয় মৌলিক উপাদান যেমন – বিভিন্ন প্রকার পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা, ডাক, টেলিফোন, বাঁধ ও সেতু, রাস্তাঘাট, শক্তি সম্পদ ইত্যাদির উপস্থিতি অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে উক্ত উপাদানসমূহ গড়ে তোলা হয় এবং এগুলির উপর ভিত্তি করেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড গতিশীল হয়। উন্নয়নের উপযোগী এসব উপাদানকেই অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলা হয়। এগুলোকে আবার ভৌত অবকাঠামোও বলা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে অর্থনৈতিক উপাদানসমূহের পাশাপাশি কতিপয় সামাজিক উপাদানের উপস্থিতি অপরিহার্য। এসব সামাজিক বিষয়গুলো হল শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এসব বিষয় সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণকে প্রভাবিত করে এবং সেভাবেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও উন্নয়নের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারিত হয় বলে এগুলোকে সামাজিক অবকাঠামো বলা হয়।

অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক অবকাঠামো কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি শুধু ভৌত অবকাঠামোকেই বুঝায় না, সামাজিক অবকাঠামোকেও বুঝায়। অতএব, আমরা বলতে পারি যে, ভৌত অবকাঠামো ও সামাজিক অবকাঠামো হল অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দু'টি অংশ। একটি দেশের ভৌত অবকাঠামো দিয়ে উন্নয়ন কার্য পরিচালনা করা যায় না। আবার, সামাজিক অবকাঠামো সুদৃঢ় না হলে ভৌত অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না।

ভৌত অবকাঠামোর আবার বেশ কয়েকটি খাত আছে –

ক. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ নির্মাণ
খ. শক্তি সম্পদ
গ. পরিবহন
ঘ. যোগাযোগ

সামাজিক অবকাঠামোও আবার নিম্নের খাতগুলোর সমন্বয়ে গঠিত –

ক. শিক্ষা
খ. স্বাস্থ্য

তাহলে আমরা ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম। আসুন তাহলে অবকাঠামোকে একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো যাক –

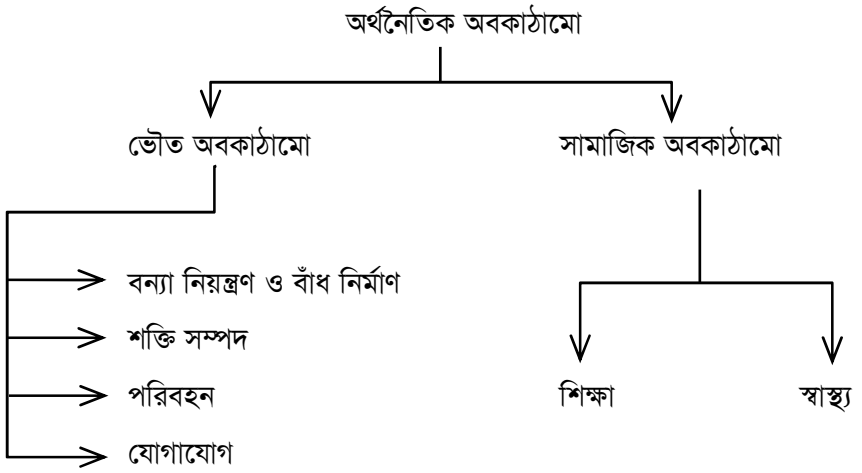

অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থের। ভৌত অবকাঠামোর নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য বিপুল পুঁজি দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করতে হয়। ফলে এ খাতে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এলাকাবাসী অথবা ব্যক্তিগত খাতও অবকাঠামোর কিছু অংশ সম্পাদন করে।

আবার সামাজিক অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান করা হলে তা ভোক্তার সুবিধার পাশাপাশি সমাজের কল্যাণও বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভোক্তার খরচের সুবিধা কেবল সে-ই ভোগ করবে না। তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারকেই সর্বাগ্রে ভূমিকা নিতে হবে। তাছাড়া, শিক্ষা-স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক চাহিদা বলে এখাতে সরকারকে বিনিয়োগ করতে হয় ; অন্ততঃ একটা ন্যূনতম পর্যায় পর্যন্ত। অর্থাৎ আমাদের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, অবকাঠামো নির্মাণে সরকার বা রাষ্ট্রকেই মূল দায়িত্ব নিতে হয়।

এখন আমরা ভৌত অবকাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব ঃ

ভৌত অবকাঠামো :

ক. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ নির্মাণ :

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। সারা দেশ নদী-নালা, খাল-বিল পানিতে উপচে পড়ে। ফলে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায় এবং বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যা বাংলাদেশে প্রতি বছরের জন্য একটি স্বাভাবিক ঘটনা যার ফলাফল হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ ফসলহানি, প্রাণহানি, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ধ্বংস এবং আরও নানান ক্ষয়ক্ষতি। এছাড়া সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের সকল সরকারই আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। প্রয়োজনীয় বাঁধ নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সরকার নিয়েছে যদিও বন্যা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় কারণ এটি একটি প্রাকৃতিক সমস্যা। রাজধানী ঢাকা শহরকে বন্যার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য ডিএনডি বাঁধ, চট্টগ্রাম শহরকে রক্ষার জন্য পতেঙ্গা বাঁধ, রাজশাহী শহরকে রক্ষার জন্য পদ্মা নদীতে বাঁধ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে জলোচ্ছ্বাস ও ঝড় থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন বাঁধ ও আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে সরকার ক্ষয়ক্ষতি কমানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

খ. শক্তি সম্পদ :

আমাদের শক্তি সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় –

১. চিরায়ত যোগান – গোবর, লাকড়ি, পাটকাঠি, খড় ইত্যাদি।

২. বাণিজ্যিক যোগান – বিদ্যুৎ, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি।

এর মধ্যে ৫৫% আসে চিরায়ত যোগান থেকে, ২৪% প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে, ১৯% পেট্রোলিয়াম থেকে এবং বাকী ২% পানি বিদ্যুৎ থেকে।

এবার আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর আলোকপাত করব।

প্রাকৃতিক গ্যাস :

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ এবং শক্তির উৎস। বাংলাদেশে মোট প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২২.৮৯৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ১৩.৫৯৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এর মধ্যে ডিসেম্বর ১৯৯৬ পর্যন্ত উত্তোলনের পরিমাণ ২.৮৫৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং এর পরবর্তী উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ ১০.৭৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ পর্যন্ত দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২০টি। মাত্র ৮টি ক্ষেত্রের ৩৬টি কূপ হতে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে (১৯৯৮ সনের জুন পর্যন্ত হিসাব অনুসারে)। ১৯৯৫-৯৬ সালে গ্যাস উত্তোলনের পরিমাণ ছিল ২৬৫.৫২ বিলিয়ন ঘনফুট এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে গ্যাস উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৭০ বিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাস ব্যবহারের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিভিন্ন খাতে এর চাহিদা ২০০২ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ৩৭৭ বিলিয়ন ঘনফুটে।

নিম্নের ছকে আমরা দেখব খাতওয়ারী প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার –

ছক : প্রাকৃতিক গ্যাসের খাতওয়ারী ব্যবহার

বৎসর	উৎপাদন	বিদ্যুৎ	সার	অন্যান্য শিল্প	চা বাগান	সিজোনাল	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালী	মোট
১৯৯৫-৯৬	২৬৫.৫১৬	১১০.৯০	৯০.৯৮	২৫.৫৮	০.৭৩	০.৯৯৫	২.৯৯৭	২০.৭০৯	২৫২.৮৮৬

গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব কারিগরী দুর্বলতার কারণে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ পর্যন্ত ৮টি ব্লকের জন্য ৬টি উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ৫টি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। নিম্নের ছকে আমরা গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য চুক্তিগুলো দেখব।

ছক : উৎপাদন বন্টনের ভিত্তিতে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য চুক্তি (ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ পর্যন্ত)

প্রতিষ্ঠান	অনুসন্ধান ব্লক	এলাকা
Oriental of Bangladesh Ltd.	ব্লক : ১৩, ১৪	বৃহত্তর সিলেট জেলা
Occidental Explorations of Bangladesh Ltd.	ব্লক : ১২	বৃহত্তর সিলেট জেলা
Cairn Energy and Holland Sea Search JV	ব্লক : ১৫, ১৬	বঙ্গোপসাগর এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা
Rexwood Okland JV	ব্লক : ১৭, ১৮	বঙ্গোপসাগর
United Meridian Corporatin	ব্লক : ২২	বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা

ইতিমধ্যে এ সকল ব্লকে অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। এর মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান বঙ্গোপসাগরে সাঙ্গু-১ কূপে একটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে এবং ১৯৯৮ সালের জুন নাগাদ তাদের জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করবে। বিদেশী বিনিয়োগের পাশাপাশি দেশের একমাত্র পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান কোম্পানি বাপেক্স তার অনুসন্ধান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভোলা জেলায় ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সালদা নদীতে একটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। অক্সিডেন্টাল সিলেট জেলায় ব্যাপক অনুসন্ধান চালাচ্ছে। ইতোমধ্যে শ্রীমঙ্গলে একটি গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধানের সময় এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে যা স্থানীয় সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। ঐ ক্ষেত্রটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

গ্যাসক্ষেত্রের সমস্যাসমূহ :

বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহের সমস্যাগুলি নিম্নরূপ :

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য গ্যাসের ব্যবহার বাড়াতে হবে। বর্তমানে যে হারে গ্যাসের ব্যবহার হচ্ছে সে হারে চলতে থাকলে আগামী ২০১৫ সাল নাগাদ নতুন কোন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হলে গ্যাস সম্পদ শেষ হয়ে যাবে।

২. বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্যাসকূপই দেশের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত নদী মেঘনা ও যমুনার কারণে এই গ্যাস পশ্চিমাঞ্চলে ও উত্তরাঞ্চলে এই গ্যাস নেয়া সম্ভব হয়নি। তাই সেখানে এখনও এল.পি. গ্যাস ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে যমুনা সেতুর উদ্বোধনের ফলে এই সমস্যার সমাধান ঘটবে বলে আমরা আশা করতে পারি।

৩. আমাদের নিজস্ব কারিগরী ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও আর্থিক বিনিয়োগের দৈন্যতার কারণে গ্যাস উত্তোলন ও অনুসন্ধানের জন্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। ফলে লাভের অধিকাংশ তাদের পকেটে চলে যাচ্ছে।

অনুশীলন :
প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় রোধে কি পরিকল্পনা নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

বিদ্যুৎ শক্তি :

যে কোন দেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি হচ্ছে বিদ্যুৎ। বাংলাদেশে চাহিদা অপেক্ষা উৎপাদনের হার অনেক কম। এ কারণে লোডশেডিং আমাদের জীবনে প্রাত্যাহিক ঘটনা। বাংলাদেশের বিদ্যুৎকে উৎসের দিক থেকে দু'টো ভাগে ভাগ করা যায় :

র. জল বিদ্যুৎ ও

রর. তাপ বিদ্যুৎ

তাপ বিদ্যুৎ আবার গ্যাস এবং তরল জ্বালানী ভিত্তিক। ১৯৯৬-৯৭ সালে উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে গ্যাসভিত্তিক উৎপাদন ছিল ৮৭.১%, জলবিদ্যুৎ ৬.৪% এবং তরল জ্বালানী ভিত্তিক উৎপাদন ৬.৫%। এবার ছকের মাধ্যমে বিদ্যুতের উৎপাদন দেখা যাক –

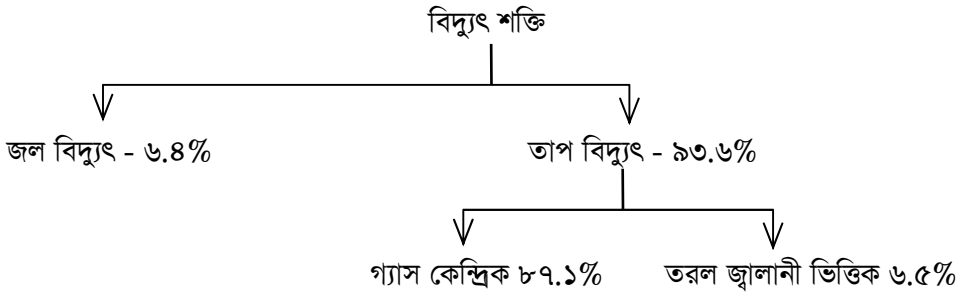

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (চউই), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB) এবং ডেসা (DESA) বিদ্যুৎ বিতরণ করে থাকে।

জুন, ১৯৯৮ দেশে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২৯০৮ মেগাওয়াট। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর ধরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাপ্তির স্বল্পতা, যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য সংরক্ষণ কাজকরণ, কাপ্তাই হ্রদের পানির স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে ১৬০০-১৮০০ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে দেশে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ২২০০ মেগাওয়াট এবং বর্তমানে (২০০০ সালে) তা ৩১৫০ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। ফলে সারাদেশব্যাপী ব্যাপক বিদ্যুৎ ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে সরকার বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে নির্মাণাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণরূপে চালু হলে অতিরিক্ত ৮৫৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এর মধ্যে রাউজান – ২১০ মেগাওয়াট ২য় ইউনিট, ঘোড়াশাল – ২১০ মেগাওয়াট ৬ষ্ঠ ইউনিট, ২১০ মেগাওয়াট সিদ্ধিরগঞ্জ, ৬০ মেগাওয়াট শাহজী বাজার এবং ১০৯ মেগাওয়াট হরিপুর কম্বাইন্ড সাইকেল রয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৬ সালের অক্টোবর হতে "প্রাইভেট সেক্টর পাওয়ার জেনারেশন পলিসি অব বাংলাদেশ" নামক বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি গ্রহণ করেছে। এ পলিসির আওতায় বেসরকারী পাওয়ার কোম্পানি ১৫ বৎসরের জন্য করপোরেট আয়কর প্রদান থেকে বিরত থাকবে এবং শুল্ক ও ভ্যাট ছাড়াই প্লান্ট ও ইকুইপমেন্ট আমদানী করতে পারবে। জরুরীভিত্তিতে বেসরকারী খাতে প্রতিটি ১০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র খুলনা, হরিপুর এবং শিকলবাহায় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে PDB বিদ্যুৎ ক্রয় করবে। এগুলো ইতোমধ্যেই চালু হয়েছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ১০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন খাতে বিদ্যুতের ব্যবহারের শতকরা হার নিম্নরূপ :

শিল্প কারখানা	–	৫৬%
বাণিজ্যিক ব্যবহার	–	১০%
গৃহস্থালী	–	২২%
অন্যান্য	–	১২%

বিদ্যুৎখাতের সমস্যা :

১. বাংলাদেশে বিদ্যুৎখাতের অন্যতম বড় সমস্যা সিস্টেম লস। ১৯৯৫-৯৬ সালে সিস্টেম লস ছিল ৩৩.৩% যার আংশিক কারিগরী ও আংশিক মনুষ্য। সিস্টেম লসের মূল কারণগুলি হচ্ছে –

i. অবৈধ সংযোগ
ii. মিটারের কম রিডিং যা কর্মচারীরা করে থাকে
iii. কারিগরী লস যার পরিমাণ ১০ - ১৫%।

২. বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অপর্যাপ্ততা।

৩. পেট্রোলিয়াম কেন্দ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পানি বিদ্যুৎ বা গ্যাস কেন্দ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়বহুল।

৪. বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমে গ্যাস উত্তোলন অস্বাভাবিক হারে হ্রাস পাওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বিঘ্নিত হচ্ছে।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য সরকারের নেয়া পদক্ষেপগুলিকেই আপনি যথেষ্ট মনে করেন ? নাকি আপনি আরও কি কি পদক্ষেপ নিতে বলেন?

পরিবহন ও যোগাযোগ :

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক কথায় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, উৎপাদনের উপকরণের গতিশীলতা বজায় রাখা, দেশব্যাপী স্থিতিশীল দ্রব্যমূল্য বজায় রাখা, দেশে অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন ও যোগাযোগ নেটওয়ার্কে দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী একটি সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অপরিহার্য। ১৯৯৫-৯৬ সালে GDP-তে এই খাতের অবদান ছিল ১২.১%।

বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বেশ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় যা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো যায় –

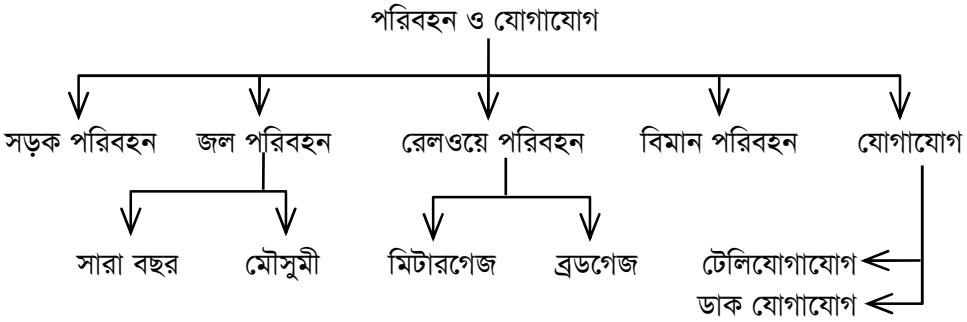

এবার তাহলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব দেখা যাক –

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব :

১. বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের জন্য ;
২. কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ;
৩. শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মজুরির তারতম্য ও বেকারত্ব দূর করার জন্য ;
৪. শিল্পের কাঁচামাল সহজে শিল্পে পৌঁছার জন্য ;
৫. কৃষি ও শিল্পপণ্যের বিস্তৃত বাজারের মাধ্যমে পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য ;
৬. দেশের সকল অঞ্চলে দ্রব্য ও সেবার সুষম বন্টনের জন্য ;
৭. প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য ;
৮. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্য ;
৯. প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ফলে সারা দেশে সুষ্ঠু নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ;
১০. দেশের জরুরী অবস্থায় ত্রাণ ও অন্যান্য সাহায্য পাঠিয়ে জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন জরুরী।

এবার দেখা যাক্ সামাজিক গুরুত্বের দিক –

১. দেশের সর্বত্র শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করার জন্য।
২. গ্রাম ও শহরের মধ্যকার বৈষম্য দূর করার জন্য।
৩. দেশের সকল অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি ও ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক ও জাতীয় সংহতি বৃদ্ধির জন্য।
৪. দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা রক্ষা ও বৈদেশিক আগ্রাসন থেকে দেশকে মুক্ত রাখার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার জরুরী।

এতক্ষণ আমরা পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রকারভেদ ও গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আমরা বিভিন্ন খাতগুলোর গুরুত্ব ও বিবরণ নিয়ে আলোচনা করব –

সড়ক পথ :

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এখানে সড়কপথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সাপেক্ষ। এছাড়া অতীতে ঔপনিবেশিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কারণে এদেশে সড়ক পরিবহন ব্যবস্থার স্বাভাবিক উন্নয়ন ও বিস্তৃতি ঘটেনি।

১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে সড়ক পথের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৫০০ কি.মি. যার মধ্যে পাকা রাস্তা ছিল ১৯৩০ কি.মি। ১৯৭০ সালে পাকা রাস্তার পরিমাণ ছিল ৩০০০ কি.মি. এবং অন্যান্য রাস্তা ছিল ৭২০০ কি.মি। ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এদেশের রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯৮৯ সালে দেশের মোট রাস্তার ৫৮.৩৩% ছিল পাকা রাস্তা, ১৬.৬৪% ছিল অর্ধপাকা এবং ২৫.০৩% ছিল কাঁচা রাস্তা। ১৯৯৫ সালে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ১৬০৭০ কি.মি.। ১৯৮৯ সালে দেশে ব্রীজের সংখ্যা ছিল ৩১৪৪টি এবং ফেরীর সংখ্যা ছিল ১৭০টি। বাংলাদেশে প্রতি ১০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় মাত্র ৭.৪৫ কি.মি. পাকা সড়ক রয়েছে যেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এর পরিমাণ হল ১৬.৭৬ কি.মি.। দেশে মোট যাত্রী পরিবহণের ৭৫% এবং পণ্য পরিবহণের ৬৫% সড়ক পথে সম্পাদিত হয়। সড়কপথে পরিবাহিত যাত্রী ও পণ্যের ৯৫% এর বেশি বেসরকারী খাতে সম্পাদিত হয় (১৯৯৮ সনের তথ্য অনুসারে)।

এবারে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহনের সমস্যার দিকটি দেখা যাক্ –

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে পরিবহন সুবিধার চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় এ দেশের সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ও উন্নত নয়। চলুন আমরা সড়ক পথের প্রধান সমস্যাগুলি দেখি –

১. ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশে সড়কপথের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বেশি।
২. বাংলাদেশের অধিকাংশ সড়ক পথ অনুন্নত।
৩. বাংলাদেশের সড়কপথসমূহ অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত।
৪. চাহিদার তুলনায় দেশের সড়কপথ অপর্যাপ্ত।
৫. দেশের সড়কপথের অধিকাংশই হচ্ছে কাঁচা যা পরিবহন চলাচলের অনুপযোগী।
৬. বাংলাদেশে আশংকাজনক হারে সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধি।

এবার তাহলে সড়ক পথের সমস্যাগুলোর কয়েকটি সমাধান দেয়া যাক্ –

১. সড়ক পথের উন্নয়ন, প্রশস্তকরণ ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার।
২. রাস্তাঘাট পরিকল্পনা অনুযায়ী করা দরকার।
৩. কাঁচা রাস্তাগুলিকে পাকা রাস্তায় রূপান্তরিত করতে হবে।
৪. প্রয়োজনীয় স্থানে সেতু নির্মাণ করতে হবে।
৫. উন্নত সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

অনুশীলন :
আপনি বাংলাদেশের সড়ক পথের পাঁচটি সমস্যা ও সমাধান লিখুন।

জলপথ :

নদীমাতৃক বাংলাদেশে প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন মাধ্যম হল জল পরিবহন ব্যবস্থা। দেশের বিভিন্ন নদীতে নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহণের ক্ষেত্রে এখনও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশে নৌ-চলাচল উপযোগী নৌ-পথ প্রায় ৬০০০ কি.মি. যা শুষ্ক মৌসুমে হ্রাস পেয়ে প্রায় ৩৮০০ কি.মি. এ দাঁড়ায় (১৯৯৮ সনের হিসাব)।

অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন ব্যবস্থায় দুটি সরকারী কর্তৃপক্ষ (B.I.W.T.A) নৌ-বন্দর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, নৌ-পথে নাব্যতা বিধান নৌ-চলাচল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, নৌ-যান নিবন্ধীকরণ, ডেক কর্মীদের প্রশিক্ষণ দান ইত্যাদি দায়িত্বে নিয়োজিত। B.I.W.T.A-এর অধীনে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮টি টার্মিনাল, ১২৭টি লঞ্চঘাট ও ৩১টি ফেরীঘাট রয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন (B.I.W.T.C) -এর অধীনে মোট জলযান রয়েছে ২৭৬টি যার মধ্যে ২১২টি বাণিজ্যিক জলযান ও ৬৪টি সহায়ক জলযান। তবে বর্তমানে ১৭৩টি জলযান চলাচলের উপযোগী রয়েছে (১৯৯৮ সনের হিসাব)। বিগত বছরগুলোতে B.I.W.T.C ক্রমাগতভাবে লোকসানের সম্মুখীন হলেও ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রায় ১.৬৭ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। ১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (B.S.C) সমুদ্র পথে নিজস্ব বহরে আমদানী-রপ্তানি পণ্য পরিবহন করে। বর্তমানে ই.ঝ.ঈ-এর ১৭টি জাহাজ রয়েছে যার মধ্যে ২টি লাইটারেজ ট্যাংকার এবং ১৫টি সাধারণ পণ্যবাহী জাহাজ। B.S.C তার নিজস্ব জাহাজ বহরের সাহায্যে দেশীয় আমদানী-রপ্তানী পণ্যের ২৫% পরিবহন করতে সক্ষম।

আসুন আমরা জলপথের সমস্যাবলী দেখি –

১. সংস্কার ও খননের অভাবে বাংলাদেশের জলপথের নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে।
২. চাহিদার তুলনায় জলযানের স্বল্পতা।
৩. আধুনিক জলযানের অভাব।
৪. শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ নাবিকের অভাব।
৫. জলপথে নিরাপত্তার অভাব।
৬. বিনিয়োগ পর্যাপ্ত নয়।
৭. জলযান নির্মাণ ও মেরামতে প্রযুক্তিগত বাধা।
৮. ভাল ঘাট ও জেটির অভাব।
৯. উপযুক্ত সংকেত ব্যবস্থার অভাব।
১০. বেসরকারী নৌ-যানগুলির ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাব।

এখন দেখা যাক – এসব সমস্যা সমাধানের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে –

১. খননের মাধ্যমে জলপথের সংস্কার।
২. অধিক সংখ্যক জলযান চালু।
৩. নৌ-যানের আধুনিকীকরণ।
৪. প্রয়োজনীয় ঘাট ও জেটি নির্মাণ।
৫. ডক ইয়ার্ড ও শিপইয়ার্ড নির্মাণ।
৬. নাবিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৭. নৌ-চলাচল আইনের যথাযথ প্রয়োগ।
৮. নৌ-পথে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৯. নৌ-পথে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
১০. নৌ-পথে আধুনিক সংকেত দান, বিশ্রামাগারও গুদাম নির্মাণ।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের জলপথকে সংস্কারের লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

রেলপথ :

আধুনিক অর্থনীতিতে রেলপথ গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন মাধ্যম। বাংলাদেশে দূরবর্তী স্থানে এবং দ্রুতযাত্রী ও মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলপথ বিশেষভাবে প্রয়োজন। তবে বর্তমানে সড়ক পথের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে পরিবহনের ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। বৃটিশ শাসনামলে ১৮৬২ সালে সর্বপ্রথম এদেশে দর্শনা হতে জগতি পর্যন্ত প্রায় ৩৫ মাইল রেলপথ স্থাপন করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এদেশে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ২৭০৬.৮৬ কি.মি। এর মধ্যে ৮৫৭.৪৭ কি.মি. ব্রডগেজ, ৮৭৫.৪৭ কি.মি. মিটারগেজ এবং ৩০.৫৮ কি.মি. ন্যারোগেজ।

১৯৭১ সালে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২৮৫৮.১৩ কি.মি. যার মধ্যে ব্রডগেজ ৯২৩.৭৪ কি.মি. এবং মিটার গেজ ১৯৩৪.৩৯ কি.মি। ১৯৯৩-৯৪ সালে তা হ্রাস পেয়ে হয় ২৭০৬.০১ কি.মি. যার মধ্যে ব্রডগেজ ৮৮৩.৫৯ কি.মি. এবং মিটারগেজ ১৮২২.৪২ কি.মি। ১৯৯৫-৯৬ সালে রেলওয়ের ইঞ্জিনের সংখ্যা ছিল ২৮২টি, যাত্রীবাহী গাড়ীর সংখ্যা ১২৭৫টি এবং অন্যান্য গাড়ির সংখ্যা ১৫০টি। ১৯৮৯-৯০ সনে দেশে রেলওয়ে স্টেশনের সংখ্যা ছিল ৫০২টি।

যাত্রী ও পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আমাদের দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় রেলওয়ে লাইন এবং গাড়ির সংখ্যা অপ্রতুল। এছাড়া যমুনা নদীর কারণে এতদিন উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি রেল যোগাযোগ বন্ধ ছিল। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধনের সঙ্গে এ সমস্যার সমাধান হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চলের রেললাইন ব্রডগেজ এবং অন্যান্য অঞ্চলের লাইন মিটারগেজ। বর্তমানে বাংলাদেশের রেলওয়ের নিজস্ব কারখানায় কিছু বগী নির্মিত হয়। কিন্তু রেলের বেশিরভাগ সাজ-সরঞ্জাম, ইঞ্জিন, কলকব্জা ইত্যাদি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে খাত লাভজনক নয়। সরকার প্রচুর টাকা লোকসান দিয়ে রেলওয়েকে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেয়ার চিন্ত াভাবনা করছে। এর পদক্ষেপ হিসেবে সরকার ঢাকা-নারায়নগঞ্জ পথে রেলওয়ে বেসরকারী খাতে ছেড়ে দিয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সনে রেলওয়ে ৩৩৩.২২ কোটি যাত্রী ও ৬৮.৯০ কোটি টন পণ্য সরবরাহ করেছে।

এখন আমরা বাংলাদেশে রেল পরিবহনের সমস্যাগুলি দেখব –

১. বাংলাদেশে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ০.০৩ মাইল রেলপথ রয়েছে যা দেশের জন্য অপর্যাপ্ত।
২. রেল পরিবহনে যাত্রীরা ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।
৩. মান্ধাতা আমলে স্থাপিত রেল লাইন এখন জরাজীর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ।
৪. বাংলাদেশের রেলগাড়ী প্রায়ই অকেজো থাকে যার কারণ হলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ও নিম্নমান।
৫. প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশের অনেক জায়গা নীচু ও মাটি নরম। ফলে নতুন রেল লাইন স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়বহুল।
৬. দক্ষ জনশক্তির অভাব।
৭. রেলওয়ে কর্মচারীদের দুর্নীতি ও যাত্রীগণের বিনা টিকেটে চলাচল করা।

বাংলাদেশের রেলপথের সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া জরুরী –

১. রেলপথের প্রতিস্থাপন, নবায়ন ও পুনর্বাসনের কাজ জরুরী।
২. রেল ইঞ্জিন ও গাড়ী ও মেরামতের জন্য আধুনিক কারখানা স্থাপন ও পুরাতন কারখানার উন্নয়ন সাধন।
৩. রেলের যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।
৪. রেল প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত।
৫. যাত্রী ভাড়া ও মাশুলের হার সঙ্গতিপূর্ণ রাখা।
৬. রেল কর্মীগণের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৭. যাত্রীগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
৮. রেলওয়েতে দুর্নীতি রোধে সরকারের কঠোর হতে হবে।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের রেলওয়ে খাতকে লাভজনক করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

বিমান পরিবহন :

বর্তমান আধুনিক বিশ্বে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার জন্য বিমান পরিবহন আবশ্যিক। তাছাড়া দেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বিমানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিমান বহরে ৪টি ডিসি ১০-৩০, ২টি এ ৩১০-৩০০ এয়ারবাস, ২টি এফ-২৮ এবং ২টি এটিপি উড়োজাহাজ রয়েছে (১৯৯৮ সনের হিসাব)। বাংলাদেশ বিমান ৮টি অভ্যন্তরীণ ও ২৫টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যস্থলে বিমান সার্ভিস পরিচালনা করছে। অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর সঙ্গে বিমানের সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৩টি আন্তর্জাতিক ও ৩টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর রয়েছে। নিম্নের ছকে আমরা বিমান বন্দরগুলোর নাম, অবস্থান এবং প্রকৃতি দেখব –

বিমানবন্দরের নাম	অবস্থান	প্রকৃতি
জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	ঢাকা	আন্তর্জাতিক
চট্টগ্রাম বিমানবন্দর	চট্টগ্রাম	আন্তর্জাতিক
কক্সবাজার বিমানবন্দর	কক্সবাজার	অভ্যন্তরীণ
ওসমানি বিমানবন্দর	সিলেট	আন্তর্জাতিক
সৈয়দপুর বিমানবন্দর	সৈয়দপুর	অভ্যন্তরীণ
রাজশাহী বিমানবন্দর	রাজশাহী	অভ্যন্তরীণ
বরিশাল বিমানবন্দর	বরিশাল	অভ্যন্তরীণ
ঠাকুরগাঁও বিমানবন্দর	ঠাকুরগাঁও	অভ্যন্তরীণ
যশোহর বিমানবন্দর	যশোহর	অভ্যন্তরীণ

দেশের অভ্যন্তরে বিমান বহরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯৯২ সালে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি হ্যাংগার কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে হ্যাংগার কমপ্লেক্সে ডিসি ১০ - ৩০ উড়োজাহাজ 'সি' চেকসহ বিমান ফ্লীটের যাবতীয় রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে জিটিসি এপ্রেন্টিস ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকার গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট (জিএসই) সংযোজনের মাধ্যমে বিমানের ফ্লাইট হ্যান্ডলিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিমান ১৯৯৫-৯৬ সনে ২৩.৬৭৪৩ কোটি টাকা নীট মুনাফা করেছে যেখানে ১৯৯২-৯৩ সনে ছিল ৬৭.৯১২৫ কোটি টাকা। বর্তমানে দেশে দু'টি বেসরকারী বিমান সংস্থা অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান পরিবহন করছে।

এবার বিমান পরিবহনের কিছু সমস্যার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক –

১. দেশের অভ্যন্তরীণ কয়েকটি বিমানবন্দরের রানওয়ের দৈর্ঘ্য নতুন এফ-২৮ বিমানের উপযোগী নয়।
২. কয়েকদিন পূর্বে নির্মিত রানওয়ে নতুন ভারী ও চওড়া বিমানের অতিরিক্ত ওজন বহন করতে না পারায় অনেক জায়গায় ভাঙ্গন দেখা দেয়।
৩. বাংলাদেশ বিমান অনেক সময় কারিগরী ও ব্যবস্থাপনার সমস্যার জন্য সঠিক সময়ে বিমান ছাড়তে পারেনা।
৪. বাংলাদেশ বিমানের যাত্রীসেবার মান নীচু হওয়ায় বিদেশী যাত্রীদের আকর্ষণ করতে পারেনা। এমনকি বাংলাদেশী যাত্রীরাও অন্যান্য বিমান সংস্থায় চলাচল করে। ফলে বিমান অনেক সময় যাত্রী স্বল্পতার সম্মুখীন হয়।
৫. দেশে বিমানের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের জন্য বিদেশী সাহায্য নিতে হয় যাতে প্রচুর খরচ হয়।
৬. বিমানের অভ্যন্তরীণ ভাড়া তাদের পরিচালনা খরচের চেয়ে কম বলে বিমানকে বিশাল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

এবার দেখা যাক সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় –

১. দেশের বিমানবন্দরগুলির রানওয়ে এবং টার্মিনাল বিল্ডিং সংস্কার করা।
২. কারিগরী দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৩. যাত্রীসেবার মান বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. বিমানের প্রতিযোগিতামূলক ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।
৫. জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ব্যবহারের বিদেশী বিমান সংস্থাগুলিকে আকৃষ্ট করতে হবে।

অনুশীলন :
বাংলাদেশ বিমান বিদেশীদের নিকট আকর্ষণীয় করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন।

যোগাযোগ :

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা পরিবহন খাত সম্পর্কে জেনেছি। এখন যোগাযোগ খাত নিয়ে আলোচনা করব।

টেলিযোগাযোগ :

বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তি নির্ভর। প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্মব্যস্ততা বেড়েই চলছে। কর্মব্যস্ত মানুষ তার নিত্য প্রয়োজনের জন্য টেলিযোগাযোগের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশের ভিতরে এবং বিদেশের সাথে টেলিযোগাযোগের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদার তুলনায় বাংলাদেশে টেলিফোনের সংখ্যা অনেক কম। বর্তমানে দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতি হাজারে ৪টি টেলিফোন আছে। এ বছর (২০০০) নাগাদ তা ৭টিতে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। ১৯৯৭ সালে দেশে ফোনের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার এবং এ বছরের (২০০০) শেষের দিকে তা প্রায় ১০ লক্ষে উন্নীত হবে।

বর্তমানে দেশের এনালগ টেলিফোন ডিজিটালে রূপান্তরিত করা হচ্ছে এবং এন ডব্লিউ ডি এলাকা সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগের জন্য ১৯৯৭ সালে ১৯৮৯০টি এন ডব্লিউ ডি সার্কিট ছিল এবং বৈদেশিক যোগাযোগের জন্য ১৯৫০টি সার্কিট রয়েছে।

টেলিফোন বঞ্চিত জনসাধারণকে টেলিফোন সুবিধা দেওয়ার জন্য ১৯৯২ সালে কার্ড ফোন স্থাপন করা হয়। ১৯৯৭ সালে কার্ড ফোনের সংখ্যা ছিল ১৪০০টি।

বেতবুনিয়া ও তালিবাবাদ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের মাধ্যমে বৈদেশিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকার মহাখালী ও সিলেটে আরও ২টি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করে বৈদেশিক টেলিযোগাযোগের অধিকতর সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ঢাকায় ১টি আন্তর্জাতিক ট্রাঙ্ক সুইচিং এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয়েছে। জনগণের সুবিধার্থে থানা হতে দেশের স্বয়ংক্রিয় এক্সচেঞ্জের সাথে যোগাযোগের সুবিধা প্রদানের জন্য থানা পর্যায়ে অপারেটর ট্রাঙ্ক ডায়ালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাতে বেসরকারী বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। থানা পর্যায়ে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন, সেলুলার মোবাইল ফোন এবং পেজিং ট্রাংকিং সার্ভিস ইতিমধ্যেই বেসরকারী খাতে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশে Citycell, Aktel ও Grameen Phone নামে তিনটি প্রতিষ্ঠান সেলুলার টেলিফোন সেবা প্রদান করছে।

ডাক যোগাযোগ :

বর্তমান বিশ্বে ডাক ব্যবস্থার গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারও ডাক সার্ভিসের সম্প্রসারণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ৪৫টি দেশের সাথে দ্রুততম এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস (ই.এম.এস) প্রবর্তন এবং ২০টি দেশের সাথে ইন্টেলপোষ্ট (ফ্যাক্স) সার্ভিস চালু রয়েছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দ্রুততর ডাক যোগাযোগের জন্য দেশের মোট ১৬১টি কেন্দ্র হতে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গ্যারান্টিড এক্সপ্রেস পোষ্ট সার্ভিস (জি.ই.পি.) সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ডাক টিকেটের মাধ্যমে দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, স্মরণীয় ঘটনাবলী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক দেশে বিদেশে তুলে ধরা হচ্ছে।

অনুশীলন :
আপনি কি মনে করেন মোবাইল ফোন দেশের প্রতিটি গ্রামাঞ্চলে পৌঁছা উচিত?

বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা আরও দ্রুততর করার লক্ষ্যে নতুন কোন ধরনের পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়।

সামাজিক অবকাঠামো :

আমরা এতক্ষণ ভৌত অবকাঠামো কি জানলাম। এবার আমরা সামাজিক অবকাঠামো সম্পর্কে জানব।

সামাজিক অবকাঠামোর প্রধান দু'টি খাত হল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। এবার এ দু'টো খাত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক্ –

শিক্ষা :

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল দক্ষ জনশক্তি। জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি তথা সার্বিক মান উন্নয়নে শিক্ষার মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। দেশের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে এবং দারিদ্র বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে সর্বস্তরে শিক্ষাকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধানতঃ তিন পর্যায়ে বিভক্ত। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ৫ বছর। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা ৭ বছর এবং উচ্চশিক্ষা ৪ বছর। বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা আরও কয়েক বছর পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রাথমিক শিক্ষা :

১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস হতে তা সারা দেশে সম্প্রসারিত করা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সরকার আগামী ১০ বছরের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর বেতন মওকুফ করা হয়েছে ও বিনা মূল্যে বই সরবরাহ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তির হার ৯৫% অর্জিত হয়েছে। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ছেলে মেয়েদেরকে উৎসাহিতকরণের ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন চলছে।

এবার আমরা ছকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা লক্ষ করব –

ছক : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা **(হাজারে)**

		১৯৯০	১৯৯৬
১.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা		
	ক. মোট	৪৭	৬৩
	খ. সরকারী	৩৮	৩৮
	গ. বেসরকারী	৯	২৫
	i. নিবন্ধনকৃত	৬	২১
	ii. নিবন্ধনহীন	৩	৪
২.	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা		
	ক. মোট	১২০৫১	১৭৬৬১
	খ. বালক	৬৬৬২	৯১৮৪
	গ. বালিকা	৫৩৮৯	৮৪৭৭
৩.	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা		
	ক. মোট	১৬১	১৬১
	খ. পুরুষ	১২৮	১১৬
	গ. মহিলা	৩৩	৪৫

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা :

উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল ও কলেজ, মাদ্রাসা, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও উচ্চশিক্ষার পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়। মাধ্যমিক স্তর ও মাদ্রাসায় ছাত্রীদের উপ-বৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। গণমাধ্যমের সাহায্যে দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ১৯৯২ সালে স্থাপিত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১৯৯৬ সনে বাংলাদেশে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল ২৫৫৪টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯৯০১টি, সাধারণ সরকারী কলেজ ২২৪টি, বেসরকারী কলেজ ৪৪টি, দাখিল মাদ্রাসা ৪২০৬টি, আলিম মাদ্রাসা ৮৯৪টি, মেডিক্যাল কলেজ ১৭টি (বেসরকারীসহ), বিশ্ববিদ্যালয় ১১টি (বেসরকারী ছাড়া)।

এবার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষাখাতের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা যাক –

১. কর্তব্য সচেতন ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন।
২. উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক সৃষ্টি।
৩. ত্যাগী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।
৪. উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা ও উদ্ভাবক সৃষ্টির মাধ্যমে নতুন পণ্য ও সেবা সৃষ্টি সম্ভব।
৫. গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ জাগ্রতকরণের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন।
৬. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দরকার উপযুক্ত শিক্ষা।
৭. জনগণের উন্নয়নমুখী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি এবং তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের জন্য তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

এবার আসুন দেখা যাক বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাবলী –

১. বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও আমাদের দেশের বর্তমান।
২. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অভাব রয়েছে।
৩. বাংলাদেশে শিক্ষার হার মাত্র ৪২.৬%। নারী শিক্ষার হার আবার আরও কম।
৪. বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার তীব্র অভাব রয়েছে।
৫. বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা অপরিকল্পিত।
৬. বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অনুসৃত পাঠ্যক্রম আধুনিক ও যুগোপযোগী নয়।
৭. বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বৈষম্য। দেশে একই সঙ্গে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে।
৮. বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।

এবারে শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যাগুলির কয়েকটি সমাধান দেখা যাক্ –

১. সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সফল ও পূর্ণ বাস্তবায়ন।
২. গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে আধুনিক/শিক্ষার প্রচলন করতে হবে।
৩. স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক ও বয়স্ক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।
৪. বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
৫. উচ্চশিক্ষাকে সমাজের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরিকল্পিত হতে হবে।
৬. নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য উপযুক্ত অবকাঠামো তৈরী করতে হবে।

৭. শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে সারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অভিন্ন নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে।
৮. পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে কি আপনি একমত? এই পদ্ধতির শিক্ষা বাস্তব জীবনে কোন কাজে আসে বলে আপনার মনে হয়?

স্বাস্থ্য :

স্বাস্থ্য সেবা জনগণের একটি মৌলিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অনুন্নত এবং স্বাস্থ্য সুবিধা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এরপরও দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং এবছর (২০০০ সাল) নাগাদ 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' লক্ষ্য অর্জনে স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সুবিধা ইতোমধ্যে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃ-শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং সংক্রামক ব্যাধিসমূহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয়েছে।
দেশের কয়েকটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালসমূহে তুলনামূলকভাবে উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়। জেলা ও থানা পর্যায়ে বিরাজমান হাসপাতাল ও থানা কমপ্লেক্সসমূহেও চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে। তবে সার্বিকভাবে সরকারী খাতের স্বাস্থ্য সেবা ও সরঞ্জাম প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।
দেশের কয়েকটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালসমূহে তুলনামূলকভাবে উন্নত ও আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়। জেলা ও থানা পর্যায়ে বিরাজমান হাসপাতাল ও থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহেও চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে। তবে সার্বিকভাবে সরকারী খাতের স্বাস্থ্য সেবা ও সরঞ্জাম প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বেসরকারী খাতে শহরগুলোতে ক্লিনিক ও হাসপাতালসমূহের ব্যয়বহুল চিকিৎসা সেবা দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে। সাধারণ জনগণ বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণ চিকিৎসা লাভের জন্য পল্লী চিকিৎসক হেকিমী, কবিরাজী, হোমিওপ্যাথী ইত্যাদির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তবে শিক্ষা বিস্তার, নগরায়ন ও আর্থিক আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগণ আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে।
১৯৯৫-৯৬ সনে বাংলাদেশে সরকারী ডিসপেনসারীর সংখ্যা ছিল ১৩৬২টি, হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীতে শয্যা সংখ্যা ছিল ২৮২০৪টি, ডাক্তার ২৪৬৩৮ জন, নার্স ১৩৮৩০ জন এবং থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩৭৪টি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বাস্থ্যখাতের ভূমিকা নিম্নরূপ :
১. জনশক্তির শারিরীক যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
২. শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বাস্থ্যগত মান বৃদ্ধি করা দরকার যা নিশ্চিত করবে উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা।
৩. বিভিন্ন ধরনের রোগ, অপুষ্টি ও শারীরিক অক্ষমতার কারণে দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক অন্যের উপর নির্ভরশীল। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী। উপযুক্ত স্বাস্থ্য সুবিধার মাধ্যমে তাদের উৎপাদনক্ষম করে তোলা যায়।
৪. অসুস্থ ও পঙ্গু মানুষদের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাদের কর্মক্ষম করে তুলে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়।

অনুশীলন :
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সমস্যাসমূহ কি কি বলে আপনার মনে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অবকাঠামো কি?
২. বাংলাদেশের শক্তি সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩. বাংলাদেশের পরিবহন খাতের সমস্যাগুলি আলোচনা করুন এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করুন।
৪. বাংলাদেশের যোগাযোগখাতের বিস্তারিত বিবরণ দিন।
৫. বাংলাদেশের সামাজিক অবকাঠামোর বর্ণনা দিন।

নৈর্বক্তিক প্রশ্ন

১. নিম্নের কোনটি ভৌত অবকাঠামো নয়?
   ক. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ নির্মাণ খ. ই-মেইল
   গ. ডাক যোগাযোগ ঘ. শিক্ষা
২. বাংলাদেশে কয়টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে?
   ক. ১৭টি খ. ১৮টি
   গ. ১৯টি ঘ. ২০টি
৩. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস কয়টি?
   ক. ২টি খ. ৩টি
   গ. ৪টি ঘ. ৫টি
৪. বাংলাদেশের রেলপথের দৈর্ঘ্য কত?
   ক. ২৫০৬.০১ কি.মি. খ. ২৬০৬.০১ কি.মি.
   গ. ২৭০৬.০১ কি.মি. ঘ. ২৮০৬.০১ কি.মি.
৫. বর্তমানে দেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সংখ্যা কয়টি?
   ক. ১টি খ. ২টি
   গ. ৩টি ঘ. ৪টি
৬. বাংলাদেশে শিক্ষার হার কত?
   ক. ৪২.৬% খ. ৩২.৬%
   গ. ৪০.৬% ঘ. ৩০.৬%

সমস্যা

মনে করুন আপনি বরিশাল থেকে ঢাকা আসছেন। আসার জন্য আপনি কি কি অবকাঠামোগত সুবিধা ভোগ করেছেন এবং অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন? এ পথের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নিতে বলেন?

উত্তরমালা

নৈর্বক্তিক প্রশ্নমালা :

পাঠ ১ : ১. ঘ ; ২. খ ; ৩. খ ; ৪. গ ; ৫. ঘ

পাঠ ২ : ১. খ ; ২. ঘ ; ৩. ক ; ৪. ঘ ; ৫. গ

পাঠ ৩ : ১. ঘ ; ২. ঘ ; ৩. ক ; ৪. গ ; ৫. গ ; ৬. ক